ঠাকুর পরিবারে সাঙ্গীতিক পরিবেশ

বলিতে গেলে ঠাকুরবাড়ী কোন না কোন ধরণের সঙ্গীত-চর্চ্চায় দিবারাত্র মুখরিত থাকিত। এমন কি সেখানকার বাতাসও যেন সঙ্গীতময় ছিল। পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তিই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। দেশী বিদেশী নানা ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদগণ ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান করিয়া এবং সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। কারণ বাড়ীর সকলেই গুণগ্রাহী ও সমঝদার শ্রোতা ছিলেন। পূজা-পার্বণে, উৎসবে ও উপাসনায় সদাসর্বদা সঙ্গীত চর্চায় ঠাকুরবাড়ী বিভোর হইয়া থাকিত। বাড়ীটিই যেন সঙ্গীতের সাগর বিশেষ ছিল। সেইজন্যই বাড়ীর সকলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কখন যে সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়া উঠিতেন তাহা নিজেরাই জানিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন এবং তাহার অনুপ্রেরণায় ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁহার পুত্রগণ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুকরণে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে ধ্রুপদের সংখ্যা ছিল অধিক। ঐ যুগে কোন এক শ্রোতা ঐ সকল গান শুনিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"দেবেন্দ্রনাথবাবুর যত্নে তাঁহার পুত্রগণ কর্তৃক সম্প্রতি বিরচিত হৃদয় দ্রবকারী ভক্তি রসাভিসিক্ত ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণকালে আমরা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি।" সুতরাং সাঙ্গীতিক পরিবেশ ঠাকুর বাড়ীর প্রত্যেককে এত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল যে তাঁহাদের দেহের শিরায় উপশিরায় রক্তের নিরবচ্ছিন্ন ধারার সহিত সঙ্গীতও প্রবাহিত হইত।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতাই ঠাকুর পরিবারের সকলকে সঙ্গীতে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। দিবারাত্র বিভিন্ন প্রদেশের স্বনামধন্য ওস্তাদগণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করিতেন এবং পরিবারের অনেকেই তাহা নিষ্ঠার সহিত শুনিতেন ও শিক্ষালাভ করিতেন। তখনকার দিনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছিল সম্ভ্রান্ত এবং ধনী পরিবারের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ অঙ্গ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না জানা এবং তালে তাল দিতে না পারা একটি লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল। সুতরাং ঐ সময় প্রতিটি খ্যাতনামা ধনী পরিবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে জ্ঞান অর্জন করা বা সঙ্গীত শিক্ষা করা অভিজাতের একটি

অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইত। সেইজন্য বড় বড় ওস্তাদগণ ধনী গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমঝদার শ্রোতা পাইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। ঠাকুর পরিবারেও ইহার কোন ব্যতিক্রম ছিল না, বরং তথায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ খুব প্রবল ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাহার একনিষ্ঠ সঙ্গীতপ্রীতির জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীরা সর্বসময় সঙ্গীত চর্চা করিতেন। ইহা ছাড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য একাধিক সঙ্গীত শিক্ষকও নিযুক্ত ছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীই প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে তাঁহাদের শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঢঙে বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীতে সুর দিতেন এবং বিভিন্ন উৎসবে তাহা পরিবেশন করিতেন। তাঁহার গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন এবং অনেকে তাঁহার প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। সকল সময় ধ্রুপদ-ধামারের মন মাতান হৃদয়গ্রাহী সুর শুনিয়া বাড়ীর সকলেই এমনকি বধূরাও সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই সঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে একদিন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম ; সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটায় ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজান একটা টেবিলের উপর বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে, দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে গান গাহিতেছি, বেশ মনে পড়ে।"

শৈশবকালে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদারচেতা এমন একজন সঙ্গীতগুরু পাইয়াছিলেন যাহা তখনকার দিনে আশা করাই যাইত না। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিদরা অত্যন্ত গোঁড়া ধরণের ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহারা প্রায়ই বাংলা গান পছন্দ করিতেন না। অথচ বৃদ্ধ বিষ্ণু চক্রবর্তী চলতি গ্রাম্য ভাষার ছড়াকে বিনা দ্বিধায় নিজে গাহিয়া শিখাইতেন।

রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা ও সেজ দাদা দরজা বন্ধ করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভাবান ছিলেন। কী কাব্যে, কী দর্শনে, কী সঙ্গীতে তাঁহার প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে। তিনি বাঁশী ও অর্গান বাজনায় নিপুণ ছিলেন এবং ১২৭৬ সালে তিনিই আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ অসীম ধৈর্যের সহিত সারাদিন তানপুরা কাঁধে লইয়া গলা সাধিয়া চলিতেন।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ব্রহ্ম সঙ্গীত ও স্বদেশী মেলার জন্য কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গীতের আর একজন একনিষ্ঠ উপাসক। কবির বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় একজন দক্ষ সেতারী ছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচিত প্রত্যেকটি বাংলা উপাসনা ও উৎসবের গান হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধাঁচে রচিত হয়। তাঁহারই প্রভাবে পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া বহু ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চার জন্য তিনি পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এক হাজার টাকা এবং রবীন্দ্রনাথকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। সুতরাং শৈশবে রবীন্দ্রনাথ যে আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছিলেন সেখানে কোন দরজাই বন্ধ ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুরের ধারা সেখানে সমানভাবে প্রবাহিত হইত।

[সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান]

বাল্যজীবনে রবীন্দ্রনাথের মনে সঙ্গীতের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের শিশু বয়সে তাঁহার মনে সঙ্গীতের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে যাঁহারা সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, জনৈক অজানা গায়ক ও শ্রীযদু ভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই ছিলেন হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সার্থক সাধক।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতেম না। তিনি যখন মনের আবেগে সেতার বাজাতেন এবং নেচে নেচে গান গাইতেন তখন আমিও সঙ্গে না গাইলে ছাড়তেন না।"

অজানা গায়ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শোনাতেন। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের সখ অনিয়মের শেখায়!" কিশোরী চ্যাটার্জী নামে এক কর্মচারীর কাছ থেকে শৈশবে রবীন্দ্রনাথ পাঁচালী গান শিক্ষা করেন। ইহার পর শ্রীকণ্ঠ সিংহের সাহায্যে তিনি সঙ্গীত জগতের সপ্ত স্বরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক একটি গান লিখিয়া

দিয়া তাঁহার মুখে সবাইকে শোনাইবার জন্য তাঁহাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া যাইতেন। রবীন্দ্রনাথ গান গাইতেন এবং তিনি সেতার বাজাইতেন।

যদুভট্টের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার প্রতিভায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। ইঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাট করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না।

বাড়ীর অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মত রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করিয়া গান শিখিতে চান নাই। যদুভট্ট তাঁহার মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া জেদ ধরিয়াছিলেন, তাঁহাকে ওস্তাদী রীতিতে গান শিখাইবেনই। তাই রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন "সেই জন্যই আমার ভাল করে হিন্দী গান শেখাই হইল না।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাঁহার একটা সুবিধা হইয়াছিল এই যে অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিল।"

লক্ষ্য করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের বিলাত প্রবাসের সময় হইতে বাল্মীকি প্রতিভার গান রচনার সময় পর্যন্ত তাহার গানে প্রচলিত বাউল, ভাটিয়ালী বা কীর্তনের প্রভাব কম ছিল এবং হিন্দী রাগসঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশী ছিল। বাল্মীকি প্রতিভা এবং ভানুসিংহের পদাবলীতে রামপ্রসাদী ও বিলাতী গানের কয়েকটি সুর ছাড়া ২২।২৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার রচিত সকল ব্রহ্ম সঙ্গীতে কীর্তন, বাউল প্রভৃতির সুর আরোপিত হয় নাই। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন' "ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছে।।"

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত, উৎসব ও উপাসনা সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন বলিয়া তিনি নিজস্ব সৃষ্টি বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ধারায় তাঁহার রচিত সঙ্গীত ভাণ্ডারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষা

ঠাকুর বাড়ীর উন্নত ও মার্জিত রুচির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশে বাড়ীর প্রতিটি ব্যক্তির শিরায় উপশিরায় সঙ্গীতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক ইচ্ছায়ও অনুপ্রেরণায় বাড়ীর সকলেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ও পিয়ানো বাজনায় নিপুন হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং কিছু ভাল ধ্রুপদী বাংলা গান রচনা করেন ও পুত্রদেরও উৎসাহ দিয়া সকলে মিলে প্রায় ৮০টির ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করেন। তবে গানের সংখ্যায় ও গুণগত মানের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ সকলকে অতিক্রম করেন। সকল রচনায় তাঁহারা বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র রায় প্রভৃতি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করেন। সেই সময় বাংলা দেশে জনপ্রিয় বিষ্ণুপুর ঘরানার অনাড়ম্বর গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল গানের পরিবেশন পদ্ধতি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং উক্ত ঘরানার খ্যাতনামা ওস্তাদদের সহিত ঠাকুর বাড়ীর সকলের ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকার জন্য বিষ্ণুপুর ঘরানাকে তাঁহারা বেশী পছন্দ করিতেন। স্বনামধন্য বহুগুণী ওস্তাদদের সমাগমে তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহশিক্ষকরূপে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গীতে তালিম দিতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী ঠাকুর বাড়ীর প্রথম সঙ্গীতগুরু হিসাবে নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে তাহার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন তাহার বর্ণনা আমরা 'ছেলেবেলা পুস্তকে'' পাই। খ্যাতনামা ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক শ্রীবিষ্ণু চক্রবর্তী সাধারণ গ্রাম্য ছড়া বিনা দ্বিধায় নিজে গাহিয়া শিখাইতেন। শিশুবয়সেই রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব ও অন্যান্য পূজাপার্বনে বাড়ীর সকল ছেলেমেয়েদের সহিত গান গাহিতেন।

ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীত শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীকণ্ঠ সিংহ দিনরাত গানে ডুবিয়া থাকিতেন। নিজে সেতার বাজাইতেন এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া গানও গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথকেও তাঁহার সহিত গান গাহিতে হইত। এমনকি তিনি গান লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে দিয়া ঘরে ঘরে গাওয়াইয়া সবাইকে শোনাইতেন এবং শ্রীকণ্ঠবাবুও তাঁহার সহিত সেতার বাজাইতেন। ইহা ছাড়া এক অজানা গায়ক ভোর বেলা রবীন্দ্রনাথকে মশারীর ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া গান শোনাইতেন। ইহা ব্যতিত বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত ধ্রুপদিয়া যদুনাথ ভট্টের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। যদুভট্টকে

তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে অনেক উঁচু ধরণের গায়ক বলিয়া মানিতেন। তাঁহার গানও তিনি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসীম প্রতিভার প্রতীক বিশেষ। মনোযোগ সহকারে যাহাই শুনিতেন তাহাই তিনি নকল করিয়া লইতে পারিতেন।

ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত তিনি বিধিবদ্ধভাবে কখনও সঙ্গীত শিক্ষার উৎসাহ বোধ করেন নাই কিন্তু যদুভট্ট রবীন্দ্রনাথের ভিতর অস্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ওস্তাদি রীতিতে গান শিখাইবার জেদ ধরিয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন—"সেই জন্যই আমার ভাল করিয়া হিন্দীগান শেখাই হইল না।"

রবীন্দ্রনাথ গান শিখিতেন লুকাইয়া লুকাইয়া। কখন কখন তিনি আনমনে ব্রহ্ম সঙ্গীত আওড়াইয়াছেন, আবার যখন মন লাগিয়াছে তখন দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান তুলিয়া লইয়াছেন। শিশুকাল হইতে সঙ্গীত চর্চার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া অতি সহজেই গান তাঁহার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ব করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দক্ষতা বলিয়া যাহা বোঝায় রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি সেইরূপ কোন অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। ছেলেবেলা হইতে তাঁহারা সব সময় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি কালোয়াতি গান শুনিয়া এই জাতীয় গানের রূপ, রস ও গাম্ভীর্য সম্পর্কে একটা সাধারণ সংস্কার তাঁহার মনের মধ্যে পাকা হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য ভাল হিন্দুস্থানী গানের মহত্ব ও মাধুর্য মনেপ্রাণে স্বীকার করিতেন। এমন কি ভাল হিন্দুস্থানী গান রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে মুগ্ধ করিত। এই সকল কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যত গান রচনা করেন তাহার অধিকাংশই হিন্দুস্থানী রাগরাগিনীর সুরকে অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ ধ্রুপদের আদর্শেই বাঁধিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে বাঁধাধরাভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয় নাই। বড় বড় ওস্তাদ ও গৃহশিক্ষকদের গান শুনিয়া ও তাহাদের সহিত গান গাহিতে গাহিতে কালক্রমে প্রায় ৮০টির মত রাগ-রাগিনী তাঁহার আয়ত্তে আসিয়াছিল; তবে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার শেষ জীবনেও প্রায় ২০টির মত রাগরাগিনীর রূপ তাঁহার মনে সব সময় ভাসিত। এই প্রকারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতে জ্ঞান অর্জন করেন।